দৈনিক বাংলা

তারিখ 01 FEB 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

011

বইয়ের সঙ্গে আড়ি—

হোসনে আরা শাহেদ

কোন প্রানে যে খৈয়াম বলেছিলেন, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হবে একদিন, রুটি-মদ তা-ও স্থায়ী নয়, একমাত্র অনন্ত যৌবনা হচ্ছে বই, তাই স্বর্গে গিয়েও আমি পুস্তক পেতে চাই—ভাবলে অবাক হতে হয়। আমরা কি বই-কে এমন করে মনে ঠাঁই দিই?

আমাদের বইয়ের দোকানগুলিতে ভিড় নেই—ক্রেতা যারা তাঁরা জানা-শোনা। তা সে বাংলাবাজারের বই পড়া হোক অথবা হোক নিউমার্কেটের বুককর্নার অথবা স্টেডিয়াম, শান্তিনগর, পুরানা পল্টনের বই ঘর। সর্বত্র ক্রেতার চেহারা একই। কারণে-অকারণে, শখে-ইচ্ছায়, প্রয়োজনে বিলাসিতায় যাঁরা বইয়ের খদ্দের বলেন, তাঁরা হিসাবের বাইরে পড়েন। একুশের মেলার কোটি টাকার বই বিক্রি আজও 'সংবাদ' হয়ে ওঠে একারণে যে বই এদেশেও বিক্রির পণ্যে পরিণত হচ্ছে। এর ফলে বইয়ের প্রতি নিস্পৃহতা কাটছে বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁরা ভেবে দেখেন না—মেলা বা বিশেষ প্রদর্শনী জাতীয় স্থানের বিক্রি পণ্যের বিক্রির স্থিতিশীলতার প্রমান হতে পারে না।

এমন অবস্থা কেন হয়েছে? আমাদের পরিবেশই বৈরী। এই বৈরিতা পাঠাভ্যাস গড়ে তোলায়। লোকাচারের আর পাঁচটি নিয়মের মতোই পাঠের অভ্যাসও শেখার ও শেখানোর বিষয়। আমাদের সমাজে বিদ্যার্থীদের পরীক্ষা মুখী ও সার্টিফিকেট-লোভী করে তোলার ব্যবস্থা যতোটা, বিদ্যার্জনে ব্রতী করার চেষ্টা ততোটা নয়। পাঠ্য-নয় এমন বই। শিক্ষার্থীর হাতে দেখলে ভয় হয়। পরবে-উৎসবে জামা জুতো খেলনা-খাবার কিনে দিতে আপত্তি নেই—বিপত্তি শুধু বই। অবসরে-অবকাশে চিড়িয়াখানায় যাওয়া যায়, বোটানিকাল গার্ডেনে নৌ-বিহারে বা বনভোজনে আনন্দ হয়, পার্ক, সার্কাস, জাদু—কোনও কিছুতেই বাধা নেই, মন টানে না ঐ বই, তাই খুব কমই লাইব্রেরীতে সন্তানকে নিয়ে যাওয়ার কথা মনে হয় কিংবা পাঠাগারের সদস্য হতে উদ্বুদ্ধ করতে সাধ যায়।

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেও একই দীক্ষা। পাঠ্যবই পাঠ চলে শ্রেণী কক্ষে, লাইব্রেরি কি পদার্থ—খুব কম স্কুলই তা জানাতে চেষ্টা করে। অনেকক্ষেত্রে স্কুল লাইব্রেরী হয় নামে-মাত্র, যেন নিয়ম-রক্ষা, যেন কাজীর গরুর কেতাবী খতিয়ান।

বৃহত্তর সমাজের সর্বাধিক অসহযোগিতা বুঝি পাঠাগারের সঙ্গেই। পাড়ায় পাড়ায় খেলার মাঠ চাই, হয়। পার্ক চাই, না হলেও আশ্বাস পাওয়া যায়। সিনেমা হল চাই, কমিটি হয়। কম্যুনিটিসেন্টার চাই, তা-ও হয়ে যায়। তবে লাইব্রেরী কেউ বড় একটা চায়-ও না, হয়-ও না।

এমন অবস্থায় কোন মন্ত্রবলে 'পাঠাভ্যাস' গড়ে তোলা যায়? বাড়িতে বাবা-মা-কে বা বড়দেরকে ছোটরা বইয়ের সঙ্গে দেখছে না— কিনতেও না, পড়তেও না, বেচারারা বই ভালো বাসতে প্রেরণা পাবে কোত্থেকে? অথচ উন্নত দেশের পাঠাভ্যাস অবাক করে দেয়ার মতন। চলার পথে বাস, ট্যাক্সি, টিউব, মেট্রো সর্বত্র বই-পত্র ম্যাগাজিন-পেপার পড়া চলছে। যাত্রীদের ব্যাগে বই-পত্র পত্রিকা কিছু না কিছু থাকছেই।

আমাদের এই পাঠ বিমুখ পরিবেশের জন্য অনেকে বিত্তকে দায়ী করেন। ঐশ্বর্য নাকি এমন জীবনের সন্ধান দেয়, সেখানে বই পড়ার মনন হারিয়ে যায়।' উদাহরণ হিসেবে তাঁরা মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের তুলনা মূলক পাঠ-ঈপ্সাকে তুলে ধরতে চান।' কথাটি সত্য যদি হয়, তবে আংশিক, পুরোটা নয়। কারণ আশৈশব পাঠ্যাস গড়ে তোলা হয় না বলেই পরবর্তী কালে অর্থ বা বিত্ত প্রতিকূল প্রভাব ফেললেও ফেলতে পারে—শুধু অর্থের পাঠ বিমুখ করার সাধ্য নেই। ঘরে বাইরে অনুকূল পরিবেশের অভাবেই সর্বস্তরের মানুষ পাঠ-নিস্পৃহ। 'নিস্পৃহতা' বলাও ভুল, পাঠ-প্রবণ করে তোলাই কঠিন। সব জিনিসের দাম কমানোর জন্য শ্লোগান-মিছিল হয়। বইয়ের সহজ লভ্যতার জন্য নয়।

অবশ্য আমাদের সামাজিক ব্যবস্থারও পাঠ-বিমুখ করার পেছনে অবদান অনেক। আমরা বড় বেশি পারস্পরিক কাজে জড়িয়ে থাকি—বলার উপায় নেই, 'আমি এখন একান্তভাবে আমার।' অন্যের জন্য ব্যস্ততা, শিরপীড়া এবং সাধারণ জীবন-প্রবাহে অনাবশ্যক ও অহেতুক জটিলতা ব্যক্তিকে তার বোধ নিয়ে স্বতন্ত্র হতে দেয় না।

তর্ক উঠতে পারে—আমাদের ঐতিহ্য কি তাই বলে? পুঁথি-পাঠ, কাব্য-পাঠ কাদের কাজ? দলবেঁধে এসব শোনা ছিল পরম আনন্দের। অথচ তখন ছিল একান্নবর্তী পরিবার—ইনভলভমেন্ট বা ইন্টারফেয়ারেন্স তখনই ছিল বরং বেশি। এর জবাবে স্থিরভাবে দেখা যায় ক্রম এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল আমাদের সমাজ-চারিত্র্যকে। আমাদের পূর্ব সূরীদের আমাদের জন্য স্কুলে গিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতে হয়নি—সঙ্গী হতে হয়নি কন্যার গ্রুপ-টীচারের কাছে পড়ার সময়ে। তাঁদের মধ্যেকার ঐক্য ও সংঘবদ্ধতা আজকের পরিবার ও সমাজজীবনে অনুপস্থিত। যুগ-সমাজ-চারিত্রকে। আমাদের পূর্ব যন্ত্রণা আমাদের অতীতের ভালোটা শুষে নিয়ে মন্দটাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা আছি এক ধরনের মিশ্রণের চক্রে।

গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়েই এগুতে হয়—কিন্তু আমাদের গ্রহণের ধারা-ও একতরফা। পশ্চিমা জগতের উগ্রতা, স্বাতন্ত্র্যবাদ, উচ্ছৃংখলতা, জীবন মত্ততা-এসবই গ্রহণ করছি দু'হাতে, বর্জন করছি তাদের আত্মনিমগ্নতা, পরচর্চা-বিমুখতা, পাঠস্পৃহা, জ্ঞানচর্চা, সাধনা। আমরা কেবলই প্রলুব্ধ হচ্ছি, উদ্বুদ্ধ না। বোয়িং-এ করে আমরা ডিগ্রী আনি, জাহাজে করে পার্থিব পদার্থ এনে ঘর ভরি—কিন্তু চিন্তা চেতনা পরিশীলনের ক্ষেত্রে পিঠ দিয়ে রাখছি।

এ কারণেই যতোই আধুনিকতার দিকে অগ্রসর হতে থাকি, বই-পুস্তক ছাপানোর উপকরণে আছি শতাব্দী-প্রাচীন অবস্থানে।

বৈপরীত্য আজ আমাদের কুরে কুরে খাচ্ছে। একদিকে সাহিত্য-পুস্তক প্রকাশে প্রতিবন্ধকতা এবং সাহিত্য পত্রিকার অকাল মৃত্যু, অন্যদিকে অশ্লীল পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধি ও চটুল পত্রিকার নিত্য নব ছাঁদে আবির্ভাব ঘটছে।

'পাঠের প্রতি আগ্রহ' পাকা ফলের মতোন লভ্য কিছু নয় যে মন চাইলেই তা পেড়ে নিয়ে নেয়া যেতে পারে। আমাদের বিপুল সংখ্যকের এখনও অবকাশ প্রচুর। ছেলেমেয়ে স্কুলে দিয়ে প্রতীক্ষারতা মা-বোনেরা আলাপ-চারিতা ভুলে বই পড়তে পারেন, পারেন যাঁরা বিউটি চর্চায় বিউটিপার্লারে যান—তাঁরা অপেক্ষমান অবস্থায় কিছু না কিছু পড়তে। সংসার ও চাকরির সময়ের সমন্বয় ঘটিয়ে সময় বাঁচিয়ে তা, উৎসর্গ করা চলে পড়াশোনা করার জন্য। সেই পড়ার নির্দিষ্ট কোনও ছক বাঁধা তো নেই শিক্ষার্থীর পাঠাভ্যাসের মতোন। তাই তা আনন্দের হতে পারে শত অর্থে। আর তাই তা টিভি, ভিসিআর-এর চমৎকার বিকল্প হতে পারে। একই তথ্য ভদ্রলোকদের জন্যও। আজও এ সমাজে তাঁদের জন্য গৃহকোণে বিপুল অবকাশ—এ অবসরটুকু নিদ্রা, আলসেমি, বন্ধু সংসর্গ বা আড্ডায় খরচ না করে পাঠের জন্য দেয়া চলে।

সমাজে সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যেই বড় বেশি দরকার পাঠ-স্পৃহা বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়ার। সব বয়সের, সব ধরনের, সব অবস্থার মন যদি রুচি ও সাধ অনুযায়ী পাঠে উৎসাহী হয়, মনে হয় জীবনের বন্ধন ও গ্লানি অনেক কমে যায়। শত কষ্টেও মানুষ বেঁচে থাকার অর্থ ও আনন্দ দুই-ই যেন খুঁজে পায়।